মক্তব প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

কুরআন শিক্ষার প্রাথমিক স্তর মক্তব। মক্তব আরবি শব্দ। অর্থ লাইব্রেরী, গ্রন্থাগার, পাঠশালা।পারিভাষিক অর্থে মুসলিম পরিবারের শিশুদের ইসলামী শিক্ষাদানের জন্য যে সকল স্থানে একত্রিত করা হয়, তাই মক্তব।মক্তব শিক্ষা সর্বযুগে সবার জন্য ছিলো উন্মুক্ত; মসজিদে নববীতে 'আছহাবে ছুফফা' নামক সাহাবাদেরকে শিক্ষাদানের জন্য রাসুল সা. একজন শিক্ষক নিয়োগ করেছিলেন, তখন থেকেই মক্তব শিক্ষার যাত্রা।ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের মক্তবই হচ্ছে মুসলিম মিল্লাতের প্রথম পাঠশালা। প্রাচীনকাল থেকে মসজিদের বারান্দাকে কেন্দ্র করে চলছে এই মক্তব শিক্ষার কার্যক্রম।শিশুদের মক্তবে যাওয়ার চিরাচরিত এই দৃশ্য এখন আর গ্রামবাংলায় খুব একটা দেখা যায় না।দুরুদ শরীফ, হামদ-নাত আর আলিফ, বা, তা এর মিষ্টি মধুর সুরের শব্দে মুখরিত হয়ে উঠে না গ্রাম কিংবা শহরের জনপদ।

প্রথম দিকে ইলমে দ্বীনের চর্চা ছিল প্রধানত মসজিদভিত্তিক।মক্কায় গোপনীয়ভাবে এর সূচনা হলেও মদীনায় হিজরতের পর মসজিদে নববী-ই ছিল দ্বীনী ইলমের প্রথম কেন্দ্র।এরপর বিভিন্ন এলাকায় নতুন নতুন মসজিদ নির্মিত হলে ইলম চর্চার প্রসার ঘটতে থাকে।মদীনার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ এক এক করে মুসলমানদের দখলে আসার পর যখন মিসর, ইরাক দামেশক ইত্যাদি দূর দেশ বিজিত হল তখন সেসব দেশেও মসজিদ ও মসজিদভিত্তিক শিক্ষার ধারা অব্যাহত থাকে।পাশাপাশি আলাদাভাবেও বহু মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়।এভাবেই একদিন অর্ধ পৃথিবীজুড়ে দ্বীনী ইলমের চর্চা প্রসারিত হয়।

খোলাফায়ে রাশেদীন ও উমাইয়া শাসনামলে সিন্ধু উপকুলে ইসলামের আগমন ঘটে।৯৩ হিজরীতে (৭১২ খৃ.) মুহাম্মাদ ইবনে কাসিম সিন্ধু জয় করলে এ অঞ্চল ইসলামী শাসনব্যবস্থার অধীনে আসে।তখন থেকেই বহু তাবেয়ী-তাবে তাবেয়ী এ দেশে দ্বীনী ইলমের বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন।৩৯০ হিজরীতে সুলতান মাহমুদ গযনবী ভারত জয় করেন। সুলতান মাহমুদ দেশের অভ্যন্তরে মসজিদ-মাদরাসা স্থাপনে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন।৪০৯ হিজরীতে কনৌজ বিজয়ের পর গযনীতে ফিরে এসে তিনি একটি আকর্ষণীয় মসজিদের

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। যে মসজিদের বিস্তারিত বিবরণ তারীখে ফিরিশতায় উল্লেখিত হয়েছে।-ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র পৃ. ২০

বাংলায় মক্তব-মাদরাসার সূচনা

সুলতানী আমলে (১২০১-১৫৭৬ খৃ.) খানকাগুলো ছিল মাদরাসার প্রাথমিক রূপ। পীর-আওলিয়াদের এসব খানকায় বয়স্কদের জন্য কুরআন-সুন্নাহ্র চর্চা শুরু হয়।এরপর মুসলিম ছেলেমেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজন মেটাতে মকতব প্রতিষ্ঠা লাভ করে।মকতব শিক্ষার কেন্দ্র ছিল খানকা, মসজিদ, মসজিদের চত্বর আবার কখনো কখনো কোনো মুসলমানের কাচারী ঘর বা বৈঠকখানা।-বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব পৃ. ১০৬

শিক্ষা কমিশনের ১৮৮২ সালের রিপোর্টেও মসজিদভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার উল্লেখ পাওয়া যায়। উক্ত রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে যে, উপমহাদেশে আগত মুসলমানরা অন্যান্য দেশের মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থার ন্যায় মসজিদভিত্তিক শিক্ষা ব্যাপকভাবে চালু করেছিলেন। ধনী মুসলমানরা এ কাজে ব্যাপকভাবে সাহায্য করতেন। শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি, পাঠ্যসূচির ব্যাপক পরিবর্তন ও জাগতিক বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করার ফলে মসজিদ ছাড়াও আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা একাদশ শতাব্দী থেকে মুসলিম সমাজে অনুভূত হতে থাকে।-বাংলাদেশের মাদরাসা শিক্ষা পৃ. ২১

বর্তমানে পাঠ্যপুস্তকের পরিবর্তন-পরিমার্জন ও বৈষয়িক বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্তি এবং গবেষণার ভিত্তিতে শিশুদের কুরআন মজীদ ও দ্বীনের মৌলিক বিষয় শিক্ষাদানের জন্য আরো কয়েকটি ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।এদের মধ্যে রয়েছে প্রাইমারি মকতব, নূরানী কুরআন শিক্ষা ইত্যাদিসহ বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী পরিচালিত শিক্ষাব্যবস্থা।

মক্তব -প্রাইমারির প্রয়োজনীয়তা

আগেই বলা হয়েছে, মকতব শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যে হল দ্বীনী বিষয়ে মৌলিক শিক্ষা দান।সহীহ-শুদ্ধরূপে কুরআন মজীদ তেলাওয়াত ও কুরআন মজীদের কিছু অংশ মুখস্থ করা, বিষয়ভিত্তিক

কিছু হাদীস ও দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়িল ইত্যাদি এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান পাঠ্যসূচি।এর দ্বারা একটি শিশু অতি অল্প সময়ে দ্বীনের মৌলিক জ্ঞান অর্জন করে এবং আল্লাহ রাববুল আলামীনের সন্তুষ্টি অর্জনের প্রেরণা তার কোমল হৃদয়ে জাগ্রত হয়।মূলত শিশুদেরকে দ্বীন ও ঈমানের সঙ্গে পরিচিত করাই এসব প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য।

বর্তমান যুগে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে।কেননা, বর্তমান প্রজন্ম কুরআন-সুন্নাহ্র ইলম ও ইসলামী আদর্শ থেকে দূরে সরে শুধু বৈষয়িক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠছে।অর্থ উপার্জনই হয়ে দাড়িয়েছে জীবনের পরম লক্ষ্য।ফলে সুদ-ঘুষ, দুর্নীতি, অন্যায় ও অনৈতিক কাজের প্রসার ঘটছে।চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, খুন, ধর্ষণ ইত্যাদির ব্যাপকতায় সমাজ, রাষ্ট্র থেকে শান্তি-শৃঙ্খলা হারিয়ে গেছে।অথচ যারা এসব কাজে সরাসরি কিংবা পরোক্ষভাবে জড়িত তাদের প্রায় সবাই জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত।উচ্চ শিক্ষিত ও মেধাবী হয়েও শুধুমাত্র ইসলামী জ্ঞান ও আদর্শের অভাবেই তারা এসব অসামাজিক ও অনৈতিক কাজে জড়িত হয়ে পড়ছে।

দ্বীনী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

মানব জীবনের প্রতিটি বিষয় নিয়েই রয়েছে ইসলামের স্বতন্ত্র নীতিমালা।শিশু, যুবক, প্রৌঢ় সকল স্তরের মানুষের জন্য রয়েছে পৃথক পৃথক কল্যাণধর্মী ও সময়োপযোগী বিধান।আর এজন্যই ইসলাম প্রয়োজনীয় দ্বীনী ইলম অর্জন করাকে অপরিহার্য করে দিয়েছে।যেন অজ্ঞতার অজুহাতে ইসলামের কোনো বিধান অসম্পন্ন না থেকে যায়।ইলম অর্জনের অপরিহার্যতা সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, প্রতিটি মুসলিমের জন্য ইলম অন্বেষণ করা ফরয।

উপরোক্ত হাদীস থেকে দ্বীনী ইলম অর্জনের শরয়ী হুকুম ও গুরুত্ব অত্যন্ত স্পষ্ট।আর তা হল, প্রত্যেকের প্রয়োজনীয় পরিমাণ ইলম অর্জন করা ফরয; প্রয়োজনের অতিরিক্ত সকল বিষয়ের বিস্তারিত জ্ঞান প্রত্যেকের জন্য ফরয নয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইসলামের সকল আহকাম প্রধানত প্রাপ্তবয়স্কদের উপর আরোপিত হয় এবং তাদের জন্য এসব আহকাম পালন করা আবশ্যকীয় হয়।তবে একজন মুসলমান প্রাপ্তবয়সে উপনীত হওয়ার পর অজ্ঞতার অজুহাতে শরীয়তের কোনো হুকুম পালনে অলস বা উদাসীন না হয় এজন্য শৈশব থেকেই তাদেরকে দ্বীনী ইলম শিক্ষা দেওয়ার তাকিদ করা হয়েছে।আর এ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে অভিভাবকদের উপর।নিজ সন্তানের তালীম-তরবিয়তসহ যাবতীয় বিষয় নিশ্চিত করতে অভিভাবকদেরকে কঠোরভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।কুরআন মজীদে

ইরশাদ হয়েছে, তরজমা : 'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেকে ও নিজের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর।'-সূরা তাহরীম : ৬

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, তরজমা : তোমরা সকলেই দায়িত্বশীল।আর প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

সুতরাং অভিভাবকদের কর্তব্য হল, শৈশবেই সন্তানকে দ্বীনের মৌলিক জ্ঞান দান এবং তাদেরকে ইবাদতের প্রতি উৎসাহী করে তোলা।বিশেষ করে নামাযের বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন থাকা কর্তব্য।ছোট কাল থেকেই সন্তানকে নামাযের মৌলিক মাসআলা-মাসায়িল শিক্ষা দেওয়া এবং নামাযের ব্যাপারে অভ্যস্থ করে তোলা উচিত।প্রয়োজনে প্রহারের নির্দেশও রয়েছে ইসলামে।হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, তরজমা : তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে নামাযের আদেশ কর যখন তাদের বয়স সাত বছর হয়।আর যখন দশ বছর হয় তখন তাদেরকে (প্রয়োজনে) প্রহার কর।

মোটকথা, শৈশব থেকেই সন্তানের দ্বীনী শিক্ষার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা, তাকে আমল-ইবাদতের প্রতি উৎসাহিত করা এবং নেক তরবিয়ত নিশ্চিত করা প্রতিটি সচেতন মুসলিম অভিভাবকের দায়িত্ব।

শৈশবে শিশুর মন-মস্তিষ্ক থাকে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও নিষ্কলুষ।এ সময়ে শিশুরা যা শোনে, যা শেখে সবই তার কচি মনে রেখাপাত করে।তার স্মৃতিতে স্থায়ীত্ব লাভ করে।শৈশবকালই হচ্ছে একটি শিশুর ঈমান-আমল শিক্ষাদানের উপযুক্ত সময়।

মনে রাখা উচিত যে, ধর্মের মৌলিক ও প্রয়োজনীয় পরিমাণ জ্ঞান অর্জনের পর বৈষয়িক কিংবা জাগতিক কোনো জ্ঞান লাভ করাও নিষিদ্ধ নয়; বরং ধর্মীয় জ্ঞানের পাশাপাশি জাগতিক ও বৈষয়িক জ্ঞান লাভের অবকাশ রয়েছে।তবে এই শিক্ষাগ্রহণ ও কর্মক্ষেত্রে তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে ইসলামের আদর্শ ও বিধি-নিষেধ মেনে চলাও আবশ্যক।

সুতরাং অভিভাবকগণ সন্তানদেরকে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি চাকরি, ব্যাবসা কিংবা অন্যান্য বৈধ অবলম্বন গ্রহণের উদ্দেশ্যে বৈষয়িক কিংবা জাগতিক কোনো শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারেন।তবে সর্বাবস্থায় ইসলামী আদর্শ ও নীতিমালার ব্যাপারে সচেতন থাকা আবশ্যক।

বর্তমান সময়ের মক্তব -মাদরাসা

পূর্বের মতো এখনো শহর, গ্রামসহ দেশের সর্বত্র মসজিদভিত্তিক মকতব পরিচালিত হয়ে আসছে।তবে কোনো কোনো অঞ্চলে স্থানীয়দের সম্মিলিত উদ্যোগে কিংবা কোনো দানশীল, ধর্মানুরাগী ব্যক্তির ব্যক্তিগত উদ্যোগেও কিছু মকতব গড়ে উঠেছে।যেগুলো ফুরকানিয়া, কারিয়ানা, মকতব ইত্যাদি নামে পরিচিত।মকতব-শিক্ষার কিছু ধারা এমনও রয়েছে যাতে দ্বীনের মৌলিক শিক্ষার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় জাজতিক বিদ্যাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বেশ গবেষণার ভিত্তিতে এর পাঠ্যসূচি নির্ধারিত হয়েছে। যার মধ্যে নূরানী তা'লীমুল কুরআন, নাদিয়াতুল কুরআন, খুদ্দামুল কুরআন, দ্বীনিয়াত ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এসব স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান ছাড়াও দীর্ঘ মেয়াদী কওমী মাদরাসাগুলোতেও রয়েছে প্রাথমিক স্তরের নূরানী শিক্ষাব্যবস্থা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এসব প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ বেসরকারীভাবে পরিচালিত। সরকারী কোনো অনুদান এর জন্য বরাদ্দ নেই।শুধুমাত্র দ্বীনদার ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতাই এসব প্রতিষ্ঠানের আর্থিক উৎস।

এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান উন্নয়ন ও পঠন-পাঠনরীতির সহজিকরণের লক্ষ্যে মকতব শিক্ষকদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণকেন্দ্রও গড়ে উঠেছে। তার মধ্যে নূরানী তালীমুল কুরআন,

নাদিয়াতুল কুরআন, নূরিয়া তালীমুল কুরআন, নাজাতুল উম্মাহ, খুদ্দামুল কুরআন ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।এসব প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে শিক্ষকগণ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিশুদেরকে উন্নত ও সহজ পদ্ধতিতে কুরআন মজীদ পাঠদানে নিয়োজিত রয়েছেন।

মসজিদভিত্তিক মক্তব সম্পর্কে একটি অভিযোগ

আমাদের দেশের মসজিদভিত্তিক মকতবগুলোর ব্যাপারে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবারের অভিভাবকগণ একটি অভিযোগ করে থাকেন যে, এসব মকতবে আসা ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকাংশ হল নিম্নবিত্ত পরিবারের।তাছাড়া এসব মকতবে বসার পরিবেশ থাকে না।

প্রথম কথা এই যে, সকল মকতবের ক্ষেত্রে এই কথাটা প্রযোজ্য নয়।যেখানে অপরিচ্ছন্নতা ও অন্যান্য অসুবিধা রয়েছে তা দূর করার জন্য তো আমাদেরই আন্তরিক হওয়া উচিত।যেখানে সন্তানের বৈষয়িক ও জাগতিক শিক্ষার জন্য একটি শিশুর পিছনে মোটা অংকের টাকা খরচ হয়ে যায় সেখানে শিশুর দ্বীনী শিক্ষার জন্য সামান্য কিছু অর্থ ব্যয় করে তার শিক্ষার পরিবেশটা কি উন্নত করা যায় না? এতে যেমনিভাবে সন্তানের ধর্মীয় শিক্ষা নিশ্চিত করে অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করা হয় তেমনি সদকায়ে জারিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ছওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়।তাই শুধু পরিবেশের অজুহাত দেখিয়ে নিজের সন্তানকে ধর্মীয় জ্ঞান থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়; বরং পরিবেশের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হওয়া এবং সমাজের অন্যান্য শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষার সুব্যবস্থা করে সদকায়ে জারিয়ায় এগিয়ে আসা বিত্তবানদের কর্তব্য।

অভিভাবকদের প্রতি আবেদন

বর্তমান বিশ্বের সকল আবিষ্কার ও গবেষণা পরবর্তী প্রজন্মকে ঘিরে। পরবর্তী প্রজন্মের জীবনযাপনের ধরন, তাদের সংস্কৃতি, আদর্শ ও প্রযুক্তি কী হবে এসব নিয়ে ব্যাপক গবেষণা হচ্ছে।অথচ মুসলমান হয়ে শুধু আমরাই পিছিয়ে।আমাদের আগামী প্রজন্মের শিক্ষা-দীক্ষা,

চরিত্র ও নৈতিকতার বিষয়ে আমাদের যেন বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই।অথচ আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের দায়িত্ব আমাদের কাঁধে।তাদের ধর্মীয় শিক্ষা নিশ্চিত করার আমাদের কর্তব্য।

মনে রাখা উচিত, আজকের শিশুরাই আগামীর অভিভাবক।অভিভাবক নিজেই যদি দ্বীনী ইলম থেকে বঞ্চিত থাকে তাহলে সন্তানও যথাযথ ধর্মীয় জ্ঞান লাভ করতে পারে না।যেমনটি বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।অভিভাবকদের উদাসীনতা কিংবা নিজের অলসতায় আজকের অভিভাবকেরা শৈশবে ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা না করায় এর প্রভাব তাদের সন্তানদের উপর পড়ছে।এভাবে যদি শৈশব থেকেই শিশুর ধর্মীয় শিক্ষা নিশ্চিত করা না হয় তাহলে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধর্মীয় শিক্ষা থেকে অনেক দূরে সরে যাবে।তখন অন্যায়-অত্যাচার, দুর্নীতি ইত্যাদি অনৈতিক ও অসামাজিক কাজ নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়ে পরিণত হবে।সবচেয়ে বড় কথা, অভিভাবকদেরকে সন্তানদের ব্যাপারে জবাবদিহিতার কাঠগড়ায় দাড়াতে হবে।তাই আমাদের উচিত আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কথা ভেবে তাদের ধর্মীয় শিক্ষা নিশ্চিত করা।

আমির-উমারা, অলি-দরবেশ, পীর-মাশায়েখ, শিক্ষক-সাংবাদিক, কৃষক-শ্রমিক মক্তবের মাধ্যমে শিক্ষাজীবন শুরু করেছেন। অনেক লোককে বলতে শোনা যায়, আমি জীবনে কোনোদিন স্কুলের ধারে-কাছে যাইনি।কিন্তু মক্তবে যাইনি, এমন কথা বলার মতো মানুষ সমাজে পাওয়া মুশকিল।এই হলো মক্তব শিক্ষার প্রভাব ও বিস্তৃতি।এভাবেই মক্তব শিক্ষা মুসলিম সমাজের অন্যতম সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে।বলা হয়, ভালো মানুষ হওয়ার জন্য মক্তব শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।

শিশুরা নৈতিক শিক্ষার প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করে কোরআন শিক্ষার পাঠস্থান মক্তব থেকে। কিন্তু দুঃখের কথা হলো, ধীরে ধীরে সমাজ থেকে মক্তব শিক্ষা হারিয়ে যেতে বসেছে। ভোরবেলায় শিশুদের মক্তবে যাওয়ার চিরাচরিত দৃশ্য এখন আর গ্রামবাংলায় খুব একটা দেখা যায় না।মসজিদের বারান্দাগুলো দরুদ শরিফ, হামদ-নাত আর আলিফ-বা-তা এর মিষ্টি মধুর সুরের শব্দে মুখরিত হয় না।শোনা যায় না, শত কণ্ঠে সকালে কোরআনের আওয়াজ।

যেহেতু মক্তব থেকে শিশুদের নৈতিক শিক্ষার যাত্রা শুরু, তা যদি হারিয়ে যায়, তাহলে আমাদের সামনেই আমাদের শিশুরা নৈতিকতা বিবর্জিত অবস্থায় বড় হয়ে উঠবে। যা কোনোভাবেই কাম্য নয়।কেননা আজকের শিশু আগামী দিনে দেশের নেতৃত্ব দেবে।সেই শিশুরা সুন্দরভাবে বেড়ে না ওঠলে সভ্য সমাজের আশা করা যায় না।এ জন্য মক্তবগুলো চালু রাখা দরকার।

অনেক মক্তব রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।আবার কোথাও কোথাও যা চালু আছে, সেগুলোতে আগের মতো আনন্দ নেই, শিক্ষার্থীর উপস্থিতি নেই, নামে মাত্র চলে। একজন মুসলমান হিসেবে যতটুকু জ্ঞানার্জন জরুরি তার সিংহভাগ মক্তব থেকেই অর্জন করা সম্ভব।যে ব্যক্তি সঠিকভাবে অজু করতে জানে না বা ফরজ গোসল করতে জানে না, সে নামাজ পড়বে কিভাবে? অন্তত নামাজ পড়ার জন্য কয়টি সুরা শুদ্ধভাবে জানা প্রয়োজন, একজন মুসলমান হিসেবে সেগুলো শিখে রাখা জরুরি। আর শৈশবেই এ আলোকে সন্তানদের গড়ে তোলা না গেলে কারণে-অকারণে সে সুযোগ হয়ে ওঠে না। এমন চিন্তা থেকে একসময় ভারতীয় উপমহাদেশে মসজিদে মসজিদে চালু হয় মক্তব শিক্ষা, যার মাধ্যমে প্রতিটি শিশু ইসলামের মৌলিক জ্ঞানগুলো অর্জন করতে পারত।

মুঘল আমলে মক্তব শিক্ষার ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা ছিল।মক্তবে কোরআন শিক্ষার পাশাপাশি মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন ও বড়দের সালাম এবং সম্মান দেওয়া, সুন্দর ও মার্জিত ভাষায় কথা বলা ছাড়াও শিক্ষা দেওয়া ছাড়া বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয়।মক্তবে সহিহ-শুদ্ধভাবে সুরা-কেরাত পড়ার যোগ্যতা অর্জন, বিশুদ্ধভাবে নামাজ আদায়ের মাসয়ালা শেখানোর সঙ্গে সঙ্গে অজু, গোসল, তায়াম্মুম, দোয়া-দরূদ, কালেমা, নামাজ, রোজা, মৃত ব্যক্তির গোসল, কাফনের কাপড় পড়ানো, দাফন করার নিয়মসহ বিভিন্ন খুঁটি-নাটি বিষয় শেখানো হয়।

এক সময়য়ে ঐতিহ্য মক্তব শিক্ষা দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে।অথচ মানুষের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার পেছনে মক্তব শিক্ষার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।মক্তব শিক্ষা হচ্ছে ইসলামের আদি এবং মৌলিক শিক্ষা।

জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরজ।বিশেষত ধর্মীয় জ্ঞান না থাকলে ধর্ম মোতাবেক জীবনযাপন করা সম্ভব নয়। আর ধর্মীয় শিক্ষার হাতেখড়ি হয় মক্তবে।

মক্তবের সুবিধা হলো, এখানে সকালে এক ঘণ্টা ধর্মীয় তালিম নিয়ে পড়ে স্কুলে স্বাভাবিক পড়াটা পড়া যায়।মুসলমানদের ঐতিহ্যের ধারক মক্তবগুলো আজ বিলুপ্তপ্রায়। মক্তবের অভাবে তৈরি হচ্ছে ধর্মীয় জ্ঞানশূন্য বিশাল জনগোষ্ঠী। দেশের সর্বত্র আজ মক্তবের সময় বিভিন্ন বেসরকারি স্কুল, কিন্ডারগার্টেন ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে মর্নিং শিফট চালু হওয়ায় শিশুরা মক্তবের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত।একশ্রেণির অভিভাবক মক্তব শিক্ষার ব্যাপারে উদাসীন হওয়ায় শিশুদের কচি মনে ইসলামি মূল্যবোধের পরিবর্তে বিজাতীয় সংস্কৃতি প্রবেশ করছে- যা সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য বিপদজনক।মক্তব শিক্ষার সে মূল্যবান সময়টুকু যদি পুনরুদ্ধার করা না যায়, তাহলে এটা নিশ্চিত যে, ঈমান-আকিদায় সমৃদ্ধ মুসলমান জাতি ভবিষ্যতে একটি দুর্বল জনগোষ্ঠিতে পরিণত হবে। শিশুদেরকে জীবনের প্রথমভাগে ইসলামি বুনিয়াদি শিক্ষা দেওয়া না হলে তাদের মনে ইসলাম সেভাবে স্থান পাবে না।ফলে পরবর্তী জীবনে নানা অপকর্মে জড়িয়ে ধ্বংসের মুখে পতিত হবে।ফলে ভবিষ্যত প্রজন্ম টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই মক্তব শিক্ষাকে বিলুপ্তি থেকে রক্ষায় চেষ্টা করা সবার নৈতিক দায়িত্ব।

যে ঘরে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত হয়, সে ঘরে আল্লাহতায়ালার রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হয় বলে হাদিসে উল্লেখ রয়েছে। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যখন লোকেরা কোনো ঘরে একত্র হয়ে আল্লাহর কিতাব কোরআন পাঠ করে, তখন তাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হয়।আল্লাহতায়ালার রহমত ও অনুগ্রহ তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলে।ফেরেশতারা তাদের বেষ্টন করে নেয় এবং স্বয়ং আল্লাহতায়ালা ফেরেশতাদের মজলিসে তাদের আলোচনা করতে থাকেন।' সহিহ মুসলিম: ২০৭৪

মক্তবের শিক্ষা ব্যক্তির ব্যবহারিক জীবনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মক্তবে আদব-কায়দা, শিষ্টাচার, সভ্যতা, ভদ্রতা, নম্রতা, সৌজন্যতা, বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করার শিক্ষা দেয়া হয়।তাছাড়া হালাল, হারাম, জায়েজ, নাজায়েজ, পাক-পবিত্রতাসহ সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় জীবন ঘনিষ্ঠ সকল শিক্ষা খুব সহজে দেয়া হয়। মক্তবের প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন শেষে পরবর্তী সময়ে অন্য শিক্ষা অর্জনের পূর্ণ সুযোগ রয়েছে। তাই মক্তবের শিক্ষাকে ধর্ম শিক্ষার সূতিকাগার বলা যেতে পারে। একারণে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্রই মসজিদে মক্তবের শিক্ষার আয়োজন ছিল।কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, সময়ের পরিক্রমায় এটা শুধু আজ কোরআন শিক্ষার প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় এসে

পৌঁছেছে। আজ মক্তবে শিক্ষা বন্ধের পথে। অথচ একটা সময় ছিল, শিশুর ইসলামি বুনিয়াদি শিক্ষার প্রাথমিক ভিত্তি ছিল মক্তব। মক্তবের শিক্ষা হারিয়ে যাওযার অন্যতম কারণ বিজাতীয় কালচারাল বিভিন্ন কিন্ডারগার্টেন, ডে-কেয়ার, ইংলিশ মিডিয়াম, মর্নিং শিফট ও বিভিন্ন বেসরকারি স্কুল খোলা হয়েছে আছে শহর থেকে গ্রামে যেখানে ভোর সকালে স্কুলে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে শিশুদের। ফলে যেমন মক্তবে শিক্ষার্থী হারিয়ে যাচ্ছে শিক্ষা বন্ধ হচ্ছে পাশাপাশি মুসলমান শিশু বঞ্চিত হচ্ছে ধর্মীয় শিক্ষা থেকে। ফলাফল ধর্মীয় জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ছে আমাদের নতুন প্রজন্ম ও সেখানে বিজয়ী হচ্ছে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি।আর মক্তবের শিক্ষা হারিয়ে যাওয়ার ফলে আজ সামাজিক ও নৈতিক অবজ্ঞয় যে কতটুকু তা সকলের পরিলক্ষিত।আজ ধর্মীয় শিক্ষার অবক্ষয়ের কারণে যুব সমাজের যে অধঃপতন তা বলাই বাহুল্য।জন্মের পর থেকেই একজন শিশু সেই ধর্মীয় শিক্ষার জন্য মক্তবে যায় না তাদের ধর্মীয় জ্ঞান আজ বন্ধ।

বর্তমানে আমাদের সমাজে একশ্রেণীর অভিভাবক আছে যারা মক্তবের শিক্ষার ব্যাপারে উদাসীন। তারা শিশুদের কচিমনে ইসলামি শিক্ষার পরিবর্তে বিজাতীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রমিত করছে, যা সমাজ, দেশ, রাষ্ট্র ও জাতির জন্য বিপজ্জনক। আজ স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নীতি- নৈতিকতা ও মূল্যবোধ শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয় কিন্তু তারা কোনোভাবেই গ্রহণ করতে পারে না, কারণ জন্মের পর থেকেই তারা এসব জ্ঞান থেকে বঞ্চিত। যার ফলে আজকের শিক্ষার্থী যারা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ তারা বিভিন্ন অপকর্ম, নেশা, পর্নোগ্রাফি, ধর্ষণ, খুন, ইভটিজিং ইত্যাদি ইসলাম ও সমাজবহির্ভূত কাজ করতে পিছুপা হয় না, কারণ তাদের মাঝে ইসলামি শরিয়াহ সুন্দর শিক্ষা ও জ্ঞান না থাকা। মুসলিম হিসেবে কি কি কাজ করতে হবে, কি করা যাবে না, এই সম্পর্কে না জানার কারণে আজ সমাজের বড় অংশ যুবসমাজ ধ্বংসের দিকে পা বাড়াচ্ছে।

শতকরা ৮০ ভাগ মুসলিম প্রধান বাংলদেশে আজ পাশ্চাত্য শিক্ষার নামে যে আধুনিকতা জাতির ঘাড়ে চেপে বসেছে তা প্রকৃত অর্থে আধুনিকতা বা উন্নয়ন নয় এক প্রকার অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা। আজ অনেক পরিবারে আধুনিকতার নামে মেয়েদের রাস্তায় বের করা, অমার্জনীয় পোশাক-পরিচ্ছেদ পরিধান করা, নারী ও পুরুষ সমান অধিকার দাবি করা ইত্যাদির কারণে অরাজকতা ও অপরাধ প্রবণতা সমাজে তৈরি হচ্ছে।

সমসাময়িক এই সমস্যাগুলোর আসল কারণ মুসলমান জাতির পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে ইসলামি শিক্ষা, শরিয়াহ ও কালচার ত্যাগ করে আধুনিক বেহায়াপনা পাশ্চাত্য সংস্কৃতি গ্রহণ করা।অথচ পৃথিবীর বুকে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ, সুন্দর গতিশীল জীবন ব্যবস্থা হলো ইসলাম।ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষা ও জ্ঞান যদি প্রতিটি পরিবারে মাঝে থাকতো, তাহলে তারা বড় হয়ে ইসলাম বিদ্বেষী কাজ করতে সাহস পেত না।

মুসলমানদের একটি বড় ক্ষেত্র যে আখিরাত আর আখিরাতে যে দুনিয়ার সকল অপকর্মের শাস্তি পেতে হবে এই জ্ঞান আমাদের পরিবারে থাকলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে আমরা, আবারো পৃথিবী শাসন করতাম।ইসলাম যে একটি ধর্মের নাম নয় একটি প্রগতিশীল জীবন ব্যবস্থা এ সম্পর্কে একজন শিশু প্রথম শিক্ষা লাভ করে মক্তবে। আর একজন শিশুর মাথায় এই ইসলামি শিক্ষা কোরআন, হাদিস, মাসয়ালা, আখলাক, চরিত্র, নীতি-নৈতিকতা, আদব-কায়দা, সম্মান, স্নেহ ইত্যাদি শিক্ষা দিতে পারলে সে ভবিষ্যতে কখনো ইসলাম বিরোধী কাজ করতে সাহস পাবে না।একটা সময় এমন ছিল যে, তখন মানুষ স্কুল, কলেজ, মাদরাসায় যাক বা না যাক মক্তবে যায়নি এমন মানুষের সংখ্যা নেই বললেই চলে।সকলে বলতেন যে কোথাও শিক্ষা অর্জন করি আর না করি মক্তবে পড়েছি।এ থেকে বুঝা যায়, তখন মক্তবে সকলেই ইসলামি দ্বীন শিক্ষায় যেত।

বর্তমান সময়ে অনেকে বলে থাকেন যে, আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের বাড়িতে শিক্ষক রেখে কোরআন শিক্ষা দেই।তা শুধু যেমন কোরআন শিক্ষার মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে এতে করে ইসলামি জীবন পরিচালনার বাকি বিষয়গুলা থেকে তারা বঞ্চিত হয়।

প্রতিযোগিতামূলক ইসলাম চর্চা না থাকার কারণে পরবর্তী জীবনে আমাদের শিশুরা যেমন কোরআন ভুলে যাচ্ছে এবং দ্বীনি বিষয়ে জ্ঞান না থাকার কারণে বিপথে চলে যায়। আর মক্তবে তাজবিদসহ কোরআন শিক্ষার সাথে দ্বীনি বিষয়েও শেখানো হয়।যদিও আমাদের দেশে কোরআন ও দ্বীনি শিক্ষার জন্য মাদরাসার এখন অভাব নেই।তবে, এর বাইরেও কিন্তু প্রচুর শিক্ষার্থী আছে যারা মাদরাসায় পড়ছে না।তারা দ্বীনি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।তাদের কোরআন ও বুনিয়াদি শিক্ষার ব্যবস্থা আমাদেরই করতে হবে যার বিকল্প হলো মক্তব।বেশকিছু দিন আগেও গ্রাম কিংবা শহরে প্রভাতী মক্তব চালু ছিল যেখানে শিশুদের কোরআন তেলাওয়াত ও দ্বীনি শিক্ষার মুখরিত হতো পথ ও প্রান্তর। কোথাই হারিয়ে গেলো সেই সোনালি অতীত?

পরিশেষে দুঃখের সাথে বলতে হয়, গ্রাম বাংলার এই ঐতিহ্যবাহী পিঠস্থান আজ কালের বিবর্তনে হারিয়ে যাওয়ার প্রান্তে।মক্তবের শিক্ষার মূল্যবান সময়টুকু যদি পুনরুদ্ধার করা না যায়, তাহলে এটা নিশ্চিত যে ইমান-আকিদায় সমৃদ্ধ মুসলমান জাতি ভবিষ্যতে একটি দুর্বল জাতিতে পরিণত হবে যা বলাই বাহুল্য।বর্তমান প্রজন্মকে ইসলামি বুনিয়াদি শিক্ষা দেয়া না হলে, চিরতরে হারিয়ে যাবে জাতির ভবিষ্যৎ।এই জাতি মদ, জুয়া, জিনা, ব্যভিচার ও নানা অপকর্মে লিপ্ত হয়ে ধ্বংসের মুখে পতিত হবে।যার প্রত্যক্ষ প্রভাব দেশে ইতোমধ্যে দেখতে পাওয়া যায়।তাই মক্তবের শিক্ষাকে বিলুপ্তির হাত থেকে পুনরায় চালু রাখা সর্বমহলের নৈতিক দায়িত্ব।ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শিক্ষা থেকে পিছিয়ে পড়া সমাজকে পুনর্গঠনে আমাদের কর্তব্য হলো ব্যক্তি থেকে শুরু করে সামাজিক পর্যায়ে মক্তব শিক্ষার বিষয়ে জোর দেয়া। মক্তবের শিক্ষাকে গণমুখী ও আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করা। এই শিক্ষার দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে তুললে প্রয়োজনে আর্থিকভাবে সহায়তা দিয়ে দেশের সুশীল সমাজ, শিক্ষাবিদ, ইমাম-খতিব, সাধারণ মানুষ ও সকল অভিভাকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মক্তবের শিক্ষার, সোনালি অতীত আবারো আসুক ফিরে এটাই কাম্য।

মুহাম্মদ বিন কাসিম ৭১১ সালে সিন্ধু বিজয়ের পর ভারতবর্ষে মক্তব ও মাদরাসা শিক্ষার সূচনা করেন।তবে শুরুর দিকে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ছিল না।মুহাম্মদ ঘোরি দ্বাদশ শতকের শেষ দিকে ভারতবর্ষে তুর্কি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে ১১৯১ সালে আজমিরে একটি ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন।ভারতবর্ষে মক্তব ও মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার বিস্তার ঘটে মূলত মোগল শাসনামলে।সেই শিক্ষাব্যবস্থা ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা ছিল সর্ব মহলে।কুরআন শিক্ষার পাশাপাশি মা বাবা, আত্মীয় স্বজন ও বড়দের কে সালাম এবং সম্মান দেয়া, সুন্দর ও মার্জিত ভাষায় কথা বলা ছাড়াও শিক্ষা দেয়া হতো আদব-ক্বায়দা! সেই সময়ে মক্তবে যে ইসলামি শিক্ষা অর্জন করেছি সেই শিক্ষাটাই আজ বাস্তব জীবনে কাজে লাগছে।কেউ কায়দা শেষ করে কুরআনে সবক নিতো সেদিন আনন্দে সবাইকে মুড়ি, বিস্কুট, ক্ষির,তুষা ইত্যাদি শিন্নী খাওয়ানো হতো।ছুটির সময় সবাই লাইন ধরে দাঁড়াতো, ছেলেরা টুপিতে আর মেয়েরা আঁচলে বা ওড়নায় নিয়ে খেতে খেতে বাড়ি ফিরতো।গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য ছিল কুরআন শুদ্ধ করে জানে এমন একটি মেয়েই হবে ঘরনী।এছাড়া পাত্রীকে কুরআনের খুঁটিনাটি জিজ্ঞেস করে পাত্রী বাছাই করা হতো।

মক্তবের প্রয়োজনীয়তাঃ

মক্তবের প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে মক্তবের প্রয়োজনীয়তা গুলি আলোচনা করা হলো:

১. আদর্শ শিক্ষালয়ঃ যে শিক্ষায় আল্লাহ কাছে জবাবদিহি করতে হবে এ ধারণা দেওয়া হয় না সে শিক্ষা কোন শিক্ষাই নয়।তাই মক্তবে আল্লাহ্ কাছে জবাবদিহি করতে হবে এ শিক্ষাটি দেওয়া হয়।

২. প্রাথমিক শিক্ষায়তনঃ মক্তবই হলো মুসলিম সমাজে প্রাথমিক শিক্ষায়তন।শিশুমন অত্যন্ত কোমল।এসময় যে শিক্ষা মক্তবে দেওয়া হয়, তাই তাদের মনে-মানসিকতায় স্থায়ীভাবে গেঁথে যায়।

৩. কুরআন-হাদীসের শিক্ষাক্ষেত্রেঃ মক্তবে শিশুরা কুরআন-হাদীসের প্রাথমিক শিক্ষালাভের সুযোগ পায়।কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেকের ওপরই ফরয।

৪. ইমান-আকীদা সম্পর্কিত শিক্ষাদানঃ শৈশব থেকেই শিশুদেরকে মৌলিক আকীদা, বিশ্বাস ও ঈমান সম্পর্কিত জ্ঞান শিক্ষা দান করা কর্তব্য।

৫. ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষাদানেঃ ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা তথা কালিমা, সালাত, সাওম, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি আদায় করার পদ্ধতি শিশুদেরকে হাতে-কলমে শিক্ষা প্রদান করে থাকে মক্তব।

৬. প্রাথমিক মাসয়ালা শিক্ষাদানেঃ মুসলিম জীবনে কিভাবে চলতে হয়, তার প্রয়োজনীয় মাসয়ালা তথা ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, হালাল, হারাম ইত্যাদি বিষয়ে মৌলিক ধারণা দিয়ে থাকে মক্তব।

৭. আদব-শিষ্টাচার শিক্ষাদানঃ মক্তবে ইসলামী জিন্দেগীর বিভিন্ন আদব-কায়দা, সৌজন্য, ভদ্রতা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া হয়।

৮. শৃঙ্খলা ও নিয়ম- কানুন শিক্ষায়ঃ মক্তবে ছোটবেলা থেকেই শিশুদের শৃঙ্খলা ও বিভিন্ন নিয়ম - কানুন শিক্ষা দিয়ে থাকে।

৯. মানবতা ও চেতনাবোধ জাগরণেঃ মক্তবে কুরআন-হাদীস শিক্ষা দেওয়া সাথে সাথে মানবিক মূল্যবোধও শিক্ষা দিয়ে থাকে।

১০. সুনাগরিকতাঃ ইসলামি মক্তবে সুনাগরিকতা শিক্ষা দিয়ে থাকে।

বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে মক্তব শিক্ষার সুবিধা গুলো বর্ণনাঃ

১. মসজিদে শিক্ষাঃ বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে মক্তবের শিক্ষা মসজিদে দিয়ে থাকে। যার ফলে শিশুদের আর অন্য কোনো জায়গায় যেতে হয় না।তাই এটি একটি অন্যতম সুবিধা।

২. মসজিদের ইমাম সাহেব শিক্ষাদানঃ বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় ইমাম সাহেব নিজে মক্তবের শিক্ষা মসজিদেই প্রদান করে থাকে যার ফলে অনেক সুবিধা হয়।

৩. মক্তব শিক্ষার জন্য দূরে যেতে হয় নাঃ মক্তব শিক্ষার জন্য দূরে যেতে হয় না।কেননা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় মসজিদ গুলাে অনেক কাছে হওয়ায় মক্তব শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য এখন আর দূরে যেতে হয় না।

৪. সঠিক শিক্ষাঃ বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে ইসলামি সঠিক শিক্ষা মক্তবের মাধ্যমে পেয়ে থাকে।

মক্তবের পরবর্তী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হলো মাদ্রাসা।এখানে ইসলামী উচ্চশিক্ষা প্রদান করা হয়।মুসলিম শাসনামলে এ অঞ্চলে মক্তব ও মাদ্রাসা চালু ছিল।তখন এগুলো সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে তোলা হতো।সুলতানি ও মোগল আমলে শাসকরা মক্তব-মাদ্রাসা পরিচালনায় উদার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। আমাদের পূর্বসূরি উলামায়ে কেরামও কোরআনি মক্তব প্রতিষ্ঠায় অবদান রেখেছেন।শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান (রহ.) বলেছেন, 'মুসলমানদের দুনিয়ার প্রভাব থেকে মুক্ত করে ইসলামের ওপর অবিচল থাকার জন্য এবং পরকালের ব্যাপারে চিন্তাশীল করে তোলার জন্য সমাজের সর্বস্তরে কোরআনি শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে।সুতরাং মুসলমান সন্তানদের কোরআন শিক্ষা দিতে সর্বস্তরে মক্তব প্রতিষ্ঠা করুন এবং সর্বসাধারণের মাঝে কোরআনি শিক্ষার ব্যাপক প্রচার-প্রসার করে সমাজকে কোরআনের আলোয় আলোকিত করুন।'

বাংলাদেশের বিশিষ্ট বুজুর্গ আলেম মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জি হুজুর (রহ.) বলেছেন, 'বাংলাদেশের ৬৮ হাজার গ্রামে ৬৮ হাজার কোরআনি মক্তব প্রতিষ্ঠা করুন। মক্তব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের কাছে ঈমানের দৌলত পৌঁছে দিন এবং তাদের মধ্যে ইসলামী আদর্শ, চেতনা ও মূল্যবোধের বীজ বপন করুন।'

হজরত হাফেজ্জি হুজুর (রহ.) নিজেও ৬৮ হাজার গ্রামে ৬৮ হাজার মক্তব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।কিছু কিছু গ্রামে করেছিলেনও।

কোথাও কোথাও মক্তবগুলো রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এমনিতেই বন্ধ হয়ে গেছে।আবার কোথাও যাও চালু আছে, সেগুলোতেও আগের মতো জৌলুস নেই।শিশুদের উপস্থিতি

নেই বললেই চলে।নামেমাত্র চলছে সেগুলো।এভাবে চলতে থাকলে ইসলামী বুনিয়াদি শিক্ষার এ অবারিত ও ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠান চিরতরে হারিয়ে যেতে পারে।পরিণত হতে পারে অতীত ইতিহাসে।তাই আমাদের নিজ নিজ এলাকার ইসলামপ্রিয় সমাজপতি এবং দায়িত্ববান অভিভাবকদের সঙ্গে পরামর্শ করে এই প্রভাতি মক্তবগুলো আলোকিত রাখার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরি।চালু করা দরকার বন্ধ হয়ে যাওয়া মক্তবগুলো।প্রয়োজনে চালু করতে হবে বৈকালিক মক্তব।আগামী প্রজন্মকে গড়ে তুলতে হবে আফসোসহীন বিশুদ্ধ কোরআন তেলাওয়াতকারী হিসেবে।আর নুরানি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকের মাধ্যমে এই মক্তবগুলো পরিচালনার উদ্যোগ নিতে হবে।এতে আমাদের দ্বারা দেশ, ইসলাম ও মুসলমানদের বিশাল খেদমতের ব্যবস্থা হবে।আর মৃত্যুর পর আমাদের কবরে পৌঁছতে থাকবে সদকায়ে জারিয়ার সওয়াব।

ক) মক্তবের ধারণা

মক্তব (مكتب) শব্দটি আরবি।এর অর্থ- লেখার স্থান শিক্ষাকেন্দ্র, বিদ্যালয় ইত্যাদি।সাধ মুসলিম বালক-বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষায়তনকে বলা হয় মক্তব।তবে মক্তব বলতে আমরা কুরআন শিক্ষার স্থানকে বুঝে থাকি।যেখানে ইসলামের প্রাথমিক, মৌলিক ও অতীব প্রয়াজনীয় শিক্ষা দেওয়া মূল গ্রন্থ কুরআন ও হাদিসের প্রাথমিক পাঠদান করা হয় এ মক্তবে।এ মক্তবে ইবাদত বন্দেগি, ওযু, গাসল সালাত, সাওম পালনের শিক্ষা দেওয়া হয়।এখানেই ব্যবহারিক জীবনের আদব-কায়দা, শিষ্টাচার, সভ্যতা ভদ্রতা, নম্রতা, নৈতিকতা, বড়দের শ্রদ্ধা, ছাটদের স্নেহ করার শিক্ষা দেওয়া হয়।

মক্তবে হালাল-হারাম, পাকপবিত্রতা ইত্যাদি প্রয়াজনীয় বিষয়াদি শিশুদের মনে খুব সহজভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়।শিশুরা শৈশবে বাবা মায়ের কাছ থেকে কিছু শিক্ষা লাভের পর মক্তবে যায়।সেখানে তারা আদর্শ শিক্ষকগণের কাছে আদর্শিক ও দ্বীনভিত্তিক শিক্ষালাভ করে।মুসলিম সমাজে মক্তব শিক্ষা হাজার বছরের ঐতিহ্য অথবা তারও বেশি। মক্কায় যখন আমাদের প্রিয় নবি ইসলাম প্রচার শুরু করেন তখন আরব দেশে শিক্ষিত লাকের সংখ্যা ছিল মাত্র সতেরা জন।এমতাবস্থায় রাসুল (সা.) মক্কায় সাফা পাহাড়ের পাদদেশে হযরত আরকাম (রা.) বাড়িতে 'দারুল আরকাম' নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করেন।

এরপর রাসুল (সা.) হিজরত করে মদিনায় স্থাপন করেন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।সেখানে তিনি মসজিদে নববীর বারান্দায় ৭০ জন শিক্ষার্থীর সমন্বয়ে সুফফা’ নামে একটি শিক্ষায়তন গড়ে তোলেন।প্রথম শিক্ষক নিযুক্ত হলেন বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (সা.) অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন হযরত আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম, আবু হোরায়রা, আবুজর গিফারী (রা.)সহ আরও নিবেদিত সাহাবিগণ।এ শিক্ষালয় ছিল আবাসিক বিদ্যালয়।সর্বোপরি তা ছিল একটি Open University (উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়)।এখানে শিশু-কিশোর যুবকবৃদ্ধ সকল বয়সের সব দেশের জ্ঞানপিপাসুরা এসে জ্ঞান আহরণ করতেন।

পরবর্তীকালে এ ঐতিহ্য আরও সমৃদ্ধ হয়।মুসলিম বিশ্বের সর্বত্রই মসজিদের সাথে মক্তব ও বিশাল পাঠাগার এবং গবেষণাগার গড়ে উঠেছিল।সেখানেই চর্চা হতো জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক।মসজিদে আল্লাহর ইবাদত হতো আর মজবে ইবাদতের পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হতো।তাই মসজিদ ও মক্তব পাশাপাশি গড়ে উঠেছিল।

খ) মক্তবের কার্যাবলী

ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষাদান:

মক্তবে ইমান, আকাইদ ও নৈতিক শিক্ষার সাথে সাথে প্রয়োজনীয় ধর্মীয় মাসআলা বুনিয়াদি শিক্ষা হাতে কলমে শেখানো হয়।যেমন- কীভাবে ওযু গোসল করতে হয় কোন ওয়াজিব ও সুন্নত এবং কী কী কারণে ওযু নষ্ট হয়।কোন নামায কীভাবে আদায় করতে শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে সুন্দরভাবে শেখানো হয়।সালাত, সাওম ইত্যাদি মৌলিক বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে ।

পরিচ্ছন্নতার প্রাথমিক জ্ঞান:

মক্তবে শিশু ওযু, গোসল, পাক-পবিত্রতার নিয়মকানুন শেখার সাথে সাথে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রাথমিক জ্ঞানলাভ করে এবং যার দ্বারা তার মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার

অভ্যাস গড়ে ওঠে।সে শরীর ও পাশোক পরিচ্ছন্ন রাখতে অভ্যস্ত হওয়ার সাথে সাথে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতেও যত্নবান হয়।

আদব-কায়দা শিক্ষা:

সমাজে পিতামাতা, ভাইবান, ছাটবড়, আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী কার সাথে কেমন ব্যবহার করতে হয়, সহপাঠীদের সাথে কীরূপ আচরণ করতে হয় মক্তবে এসব আদব-কায়দা শিক্ষা দেওয়া হয়।শৈশবে মক্তবে শেখা আদব-কায়দা, শিষ্টাচার শিশু কোনাদিন ভুলে না।

মানবতাবাধ ও চেতনাবাধের জাগরণ:

মক্তবে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি, সমবেদনা ও সহযোগিতার ব্যাপারে শিক্ষা দেওয়া হয়।শিশুদের মন কাদামাটির মতো।সুতরাং শৈশবে তাদের মানবতাবোধ ও দরদি চেতনাবোধ জাগিয়ে তোলার ফলে তাদের মধ্যে সহানুভূতি, সমবেদনা ও সহযোগিতা করার মনোভাব সৃষ্টি হয়।

সর্বজনীন শিক্ষা বিস্তার:

সর্বজনীন শিক্ষা বিস্তারে মক্তবের ভূমিকা অপরিসীম।মসজিদ সংলগ্ন মক্তবগুলোতে গণশিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করে সর্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়।এর মাধ্যমে সমাজ থেকে নিরক্ষরতা দূর করা অত্যন্ত সহজ হয়।

নিরক্ষরতা দূরীকরণ:

মক্তবভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থায় একদিকে যেমন কোন শিশুই নিরক্ষর ও শিক্ষা বঞ্চিত থাকবে না।তেমনি এখানে অবসর সময়ে বা অলস সময়ে স্বল্প ব্যয়ে সফলভাবে বয়স্ক শিক্ষার মাধ্যমে সমাজ থেকে নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করা যায়।

ইসলামি সংস্কৃতির সাথে পরিচয়:

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন ও প্রগতিশীল শাশ্বত জীবনব্যবস্থা। তাই স্বভাবতই ইসলামি অনুশাসনের প্রভাবে ইসলামে স্বতন্ত্র সংস্কৃতি রয়েছে।ইসলাম অনুমা েদিত ও ইসলামি শরিয়ত নির্দেশিত মুসলিম জাতির জীবনপদ্ধতিই হচ্ছে ইসলামি সংস্কৃতি। মক্তবে শিশুরা উস্তাদজীর সাহচর্যে থেকে যেমন ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ করে, তেমনি তারা ইসলামি সংস্কৃতির সাথেও পরিচিত হয়।

স্বদেশপ্রেম:

আর শিশুরা মক্তবে স্বদেশপ্রেম শিক্ষালাভ করে। মক্তবে অর্জিত জ্ঞানের দ্বারা দেশকে এবং দেশের মানুষকে ভালোবাসতে হবে। দেশের কল্যাণে কাজ করতে হবে এবং প্রয়োজনে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে দেশের জন্য জীবনকে উৎসর্গ করতে হবে। আমাদের প্রিয়নবি (সা.) দেশকে খুবই ভালোবাসতেন। তিনি কাফিরদের অত্যাচারে প্রিয় জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

শুদ্ধ উচ্চারণ:

মক্তব শিক্ষার মাধ্যমে শিশুরা ছোট বয়স থেকেই আর বিশুদ্ধরূপে উচ্চারণ করতে শেখে এতে তারা কোরআন শুদ্ধরূপে পড়তে পারে।

পরাশক্তির থাবায় ইসলামী শিক্ষাঃ

প্রথম চেষ্টা

ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষে ইসলামী শিক্ষাকে দুর্বল করার জন্য ব্রিটিশ সরকারের প্রথম চেষ্টা হল ভারতবর্ষের মসজিদ-মাদ্রাসা এক কথায় ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র গুলোর সম্পত্তি করা।

যেখানে মসজিদ মাদ্রাসার নামে এদেশে বিঘায় বিঘায় একরে একরে সম্পত্তি ছিল।শুধু তাই নয় এদেশের মসজিদ-মাদ্রাসার টাকা দিয়ে মসজিদের ইমাম খতিবের শিক্ষকের হাদিয়ার পাশাপাশি সমাজের অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করা হতো যাতে করে মসজিদ মাদ্রাসা ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র গুলো তাদের ব্যাপক গণমুখী কর্মসূচি অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারণে বাধাগ্রস্থ হয়।

দ্বিতীয় চেষ্টা

উলামায়ে কেরামকে গনহারে হত্যা করা ।এই হত্যার চিত্র ছিল খুবই ভয়াবহ কোথাও জ্বলন্ত আগুনে কোথাও ফুটন্ত পানিতে কোথাও জ্বলন্ত তেলে কখনো বা কোন দ্বীপে নির্বাসন দিয়ে।এই বিভিন্ন ধরনের হত্যার আয়োজনের উদ্দেশ্য একটাই যাতে করে এদেশের সাধারণ মুসলিম জনগণ ধর্মীয় গুণীজন ওলামায়ে কেরামদের সাথে কোন ধরনের এলম এবং আমলের সম্পর্কের ধারাবাহিকতা রক্ষা না করেন।কারণ ওলামায়ে কেরামের সাথে জনতার বিচ্ছিন্নতার মানেই হল সাধারণ মুসলমানদের ধর্মহীনতার দিকে ঠেলে দেওয়া।আর এই এই ষড়যন্ত্রের চেষ্টা সবসময়ই করে গিয়েছে ব্রিটিশ সরকার ও তাদের অনুসারীরা।আজও সেই চেষ্টা অব্যাহত আছে তাদের অনুসারীদের মাধ্যমে বিভিন্ন কৌশলে যা আমাদের সামনে আজ বিদ্যমান কখনো ওলামা একরামকে জনগণের সামনে জঙ্গিবাদ মৌলবাদ উগ্রবাদ বিভিন্ন অপবাদ আরোপের মাধ্যমে উম্মতের ওলামায়ে কেরামগণের ব্যাপারে সাধারণ জনগণকে ক্ষেপিয়ে রাখার চেষ্টা।

তৃতীয় চেষ্টা

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে দুইভাগে বিভক্ত করে দেওয়া। জাগতিক শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষা ।অথচ এ দেশের শত হাজার বছরের ইতিহাস হল মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল মসজিদ কেন্দ্রিক। জাগতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা ছিল এক ও অভিন্ন সে সকল শিক্ষা কেন্দ্র থেকেই জন্ম হয়েছিলেন যুগের ইবনে সিনা সহ অসংখ্য গুনিজন ।

জাগতিক শিক্ষা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি আর এ সকল শিক্ষার বিপরীতে রেখেছে সরকারি চাকরিসহ উন্নত জীবন যাপন সহ আরো অনেক আয়োজন ।

যাতে করে এদেশের গণমানুষ ধর্মহীন কর্মশিক্ষায় একচেটিয়া ঝাপিয়ে পড়ে এবং ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে।যা আজও আমরা ব্রিটিশদের ষড়যন্ত্রমূলক কর্মসূচির ভয়াবহ পরিণাম দেখে চলছি আমাদের সমাজে।

অনেক উচ্চ শিক্ষাদারীদের দিকে তাকালে তা আমরা দেখতে পাই অনেক বড় ডক্টর, ইঞ্জিনিয়ার, ডিসি, এসপি হয়েও ধর্মীয় দিকে সুরায় ফাতেহার জ্ঞানটুকুও ভালোভাবে রাখেন না ।

অথচ ব্যক্তি জীবনে ইসলামকে খুবই ভালোবাসেন। এভাবেই চলছে গণমানুষকে ধর্মহীন করার নানান আয়োজন কখনো শিক্ষার আড়ালে কখনো বা সেবার আড়ালে ।আল্লাহতালা আমাদের সকল ষড়যন্ত্রের হাত থেকে রক্ষা করুন আমিন।

সংকলক,
মাওঃ মাহবুবুর রহমান
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।